রবীন্দ্রসংগীতের মর্মলোকে

অমিতাভ মিত্র

রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে বিভিন্ন সময়ে অনেকে অনেক ভাবে আলোচনা করেছেন। যাঁরা রবীন্দ্রসংগীত চর্চায় আগ্রহী, বর্তমান প্রজন্মের যাঁরা রবীন্দ্রসংগীত প্রেমী, যাঁরা রবীন্দ্রসংগীতে অনুপ্রাণিত হন -- তাঁদের জন্য একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবনা প্রসঙ্গে এই নিবন্ধটি।

রবীন্দ্রনাথের গানের অভিকর্ষ প্রধানতঃ ভাবের দিকে। ভাবটিই তার পণ। সেই ভাব নান্দনিক। আবার সেই ভাবটিই আত্মার বোধে আলোকিত। এই ভাব, প্রকৃতির রূপে রসে তন্ময়। রবীন্দ্রনাথের গানের এইটি হল স্বরূপ। নদী যেমন বহে চলে পাড় অবলম্বন করে, রবীন্দ্রনাথের গান তেমনি বহে চলে গানের বাণী ও সুর অবলম্বন করে। প্রথমে সেই গানের বাণী যে ভাবকে ব্যক্ত করেছে, সেটি হৃদয়ের গভীরে নিতে হবে। এই বাণীর ভাবটিই মূর্ত হয়ে উঠে স্থান করে নেয় অন্তরে সুরের গভীরতায় ও বৈচিত্র্যে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি গানই কোনো একটি বিশেষ অভিব্যক্তি, কোনো একটি বিশেষ ছবি মনের ভিতরে জাগায়। এক একটি শব্দ সুরের আলপনায় বা মীড়ে বা ঝংকারে ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের গান আসলে গীতিকবিতা। কথায় তার গানের আমেজ, সুরে তার কবিতার মেজাজ। তাই এই গান সহজ সরল জীবনছন্দে মুখরিত। প্রকৃতির অন্তরে যে সুর অহর্নিশি বেজে চলেছে, কবি ভাষায় তা ছন্দোবদ্ধ করে প্রকাশ করেছেন। কথার শোভায় ও সুরের মাধুর্যে তাই রবীন্দ্রনাথের গান অপরূপ হয়ে মায়াময়তায় ভরে অভিব্যক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের গান তাই সবার অন্তরে আসন পেতে জায়গা করে নেয়। কথা ও সুরের মিলনে সংগীতে প্রাণ সঞ্চার হয়। আর প্রাণের ধর্ম হল মুক্ত হওয়া। রবীন্দ্রনাথের গান সৃষ্টির ক্ষেত্রে মুক্তিপথের চিরযাত্রী। রবীন্দ্রনাথের গানের মর্মস্থলে পৌঁছতে হলে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের জীবনটিকেও অল্পবিস্তর জানতে হবে। জানতে হবে কী করে ভারতীয় সংগীতের ধ্যানের আলোকিত রূপটি তাঁর অন্তরে ধরা দিল।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে সংগীতের প্রভাব কি ভাবে বিস্তার লাভ করে তা তিনি নিজের লেখায় অনেক স্থানেই উল্লেখ করেছেন। তাঁর ছেলেবেলায়, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী ছিল হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সংগীতের অন্যতম চর্চার কেন্দ্রস্থল। তখনকার কলকাতার ঠাকুর পরিবারে দূর দূরান্তের গুণী গায়কেরা আসতেন সংগীতের আসরে। ঠাকুর পরিবারের সদস্যরা ছিলেন শিল্প ও রসবোধ-সম্পন্ন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর পরিবারবর্গ ছিলেন সংগীত রসিক। শুধু তাই নয় সংগীত চর্চার প্রবল উদ্দীপনা ছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সন্তানদের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের দাদারা, অর্থাৎ সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং সোমেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীয় সংগীত চর্চা করতেন এবং কিছু কিছু গান রচনা করতেন ও উচ্চাঙ্গ সংগীত ঘেঁষা সুরারোপ করতেন। মহর্ষির ইচ্ছানুসারে তাঁর পুত্রেরা উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রভাবে ব্রহ্ম সংগীত রচনা ও প্রয়োগগত ব্যবহার শু করেন। সব মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যজীবনেই হিন্দুস্থানী সংগীতের পরিবেশে সামগ্রিক অনুপ্রেরণা পেয়ে যান। সেই সময়ে ঠাকুর পরিবারে যে সব সংগীত শিক্ষক আসতেন, তাঁরা হলেন তৎকালীন বিষ্ণুপুরী ঘরানার নামী গায়কেরা। এদের মধ্যে বিষ্ণু চক্রবর্তী, শ্রীকণ্ঠ সিংহ এবং যদুভট্টের নাম সবার আগে আসে। বিষ্ণু চক্রবর্তী ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায় -- "গান সম্বন্ধে আমি শ্রীকণ্ঠবাবুর প্রিয় শিষ্য ছিলাম।" মাত্র পনেরো বছর বয়সে উনি তৎকালীন বাংলার বড়ো ওস্তাদ যদুভট্টের সংস্পর্শে আসেন। ইনি ধ্রুপদ গানের ওস্তাদ ছিলেন। যদুভট্ট সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কবি বলেন -- "তারপর যখন আমার কিছু বয়স হয়েছে তখন বাড়িতে খুব ওস্তাদ এসে বসলেন যদুভট্ট। একটা মস্ত ভুল করেলন, জেদ ধরলেন আমাকে গান শেখাবেনই, সেই জন্যে গানই শেখা হল না।" এ থেকে বোঝা যায়, ঠাকুরবাড়ির সংগীত ঐতিহ্য এবং সংগীত পরিবেশ রবীন্দ্রনাথের গান রচনার প্রাথমিক অনুপ্রেরণা।

রবীন্দ্রনাথের গানের ভান্ডার বিস্ময়কর। তাঁর প্রথম বয়সে পরিবেশ ছিল শাস্ত্রীয় ধ্রুপদী পরিবেশ। এর ফলে, সমস্ত গানই তিনি শাস্ত্রীয় কাঠামোতে ফেলে প্রথম দিকে রচনা করেছেন। কিন্তু শাস্ত্রীয় মার্গের বাঁধা পথচারী হন নি। পরে মধ্যবয়সে, তাঁর সৃষ্টির প্রেরণা তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলো অভিনব সংগীতের রূপ সৃষ্টি করার দিকে। তাই আমরা রবীন্দ্রনাথের গানে বিভিন্ন প্রভাব দেখতে পাই। রবীন্দ্র সংগীতের মর্মলোকে পৌঁছতে হলে, গায়কীতে এবং পরিবেশনে এটা মনে রাখতে হবে।

ভারতীয় রাগ সংগীতের আদর্শে মূল হিন্দী গানকে অনুসরণ করে, সুরের কাঠামোটিকে অপরিবর্তিত রেখে কিছু কিছু সুরের, লয়ের এবং ছন্দের পরিবর্তন ঘটিয়ে রচনা করেছেন। সুবিধার জন্য, কিছু উদাহরণ তুলে ধরছি--

(ভারতীয় রাগ সংগীতের আদর্শে ভাঙা হিন্দী গান)

রবীন্দ্রসংগীত	মূল হিন্দী গান	রাগ-তাল
১) অন্তরে জাগিছ	কোন যোগী ভয়ো	বেহাগ-ঝাঁপতাল
২) আছ অন্তরে চিরদিন	কৈসে অব ধরো ধীর	কাফী-চৌতাল

৩)	আজি এ আনন্দ সন্ধ্যা	বহুর বাজাও বাঁশি	পূরবী-তেওড়া
৪)	আনন্দধারা বহিছে ভুবনে	লাগি মোরে ঠুমক	মালকোষ-ত্রিতাল
৫)	এ কি সুন্দর শোভা	বাজু রে মন্দর বাজু	ইমন ভূপালী-ত্রিতাল
৬)	একি কণা কণাময়	নই রে মা বরণ	বাহার-কাড়াঠেকা
৭)	এখনো তারে চোখে দেখিনি	পায়েলিয়া মোরে	ইমন-কাওয়ালী
৮)	ওরে, ভাই ফাগুন লেগেছে	এরি মা সব বন অমূয়া	পরজ বাহার-ত্রিতাল
৯)	কার মিলন চাও বিরহী	তনু মিলন দে পরবর	শ্রীরাগ-তেওড়া
১০)	কোথা যে উধাও হল	বোল রে পাপিয়ারা	মিঞামল্লার-ত্রিতাল
১১)	গহন ঘন ছাইল	ইন্দু হুঁ কী অসররী	হাম্বীর-চৌতাল
১২)	ডাকে বারবার ডাকে	মোহে কৈসে নিকি	কেদার-ত্রিতাল
১৩)	তব প্রেমসুধা রসে	কারি কারি কামরিয়া	পরজ-ত্রিতাল
১৪)	তিমিরময় নিবিড় নিশা	প্রবল দল মেঘ	মেঘ-ঝাঁপতাল
১৫)	তুমি কিছু দিয়ে যাও	কৈ কিছু কহরে	খাম্বাজ-কাহারবা
১৬)	তোমা লাগি নাথ	তুম বিন রহো	পূরবী-চৌতাল
১৭)	তোমারি গেহে	আজ শ্যাম মহোলিয়া	খাম্বাজ-একতাল
১৮)	তোমারি মধুর রূপে	তেরো হি নয়ন বাণ	ঝিঁঝিঁট-চৌতাল
১৯)	দাও হে হৃদয় ভরে দাও	পালা মুঝে ভরি দে	রামকেলি-ত্রিতাল
২০)	নব আনন্দে জাগো	অধর ধরে বন বাঁশরী	টোড়ী-ত্রিতাল
২১)	মহাবিশ্ব মহাকাশে	মহাদেব মন্ধের	ইমনকল্যাণ-তেওড়া
২২)	মহারাজ একি সাজে	মেরে দুন্দদল সাজে	বেহাগ-ঝাঁপতাল
২৩)	সুখহীন নিশিদিন পরাধীন	দারাদীম্ দারাদীম্	নটমল্লর-ত্রিতাল
২৪)	সুধাসাগর তীরে	আয়ো ফাগুন বঢ়ো	কানাড়া-ধামার
২৫)	হৃদয় নন্দন বনে	উড়্ত বন্দন নব	লোলিতগৌরী-ঝাঁপতাল

বিশাল রবীন্দ্রসংগীত ভান্ডারে এর পর আমরা আর মূল হিন্দী গানের অনুসরণ পাই না। এবার স্বকীয় রচনার যুগ। যদিও হিন্দুস্থানী সংগীতের প্রভাব পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে প্রচলিত রাগ রাগিণীগুলির প্রয়োগ কবি নতুনভাবে করেন। সুরে এসেছে রাগ রাগিণীর মিশ্রণ, যেটি কাব্যকে করেছে মুক্তছন্দ। বিভিন্ন গানের ভাব প্রকাশে বিভিন্ন রাগ রাগিণীর ব্যবহার করার ফলে কিছু কিছু রাগ শুদ্ধতা হারায়, কিন্তু একটি নতুন রূপ লাভ করে। অভিনব এক বিন্যাস পাই সুরে যেমন, বেহাগের সুরে "দীপ নিভে গেছে মম" গানটিতে "ক্লান্ত" কথাটির যথার্থতা বোঝাতে কোমল ণি ব্যবহার করে বেহাগের বিশুদ্ধতা হারালেন বটে, কিন্তু "ক্লান্ত" কথাটি অনেক শ্রুতিমধুর করলেন। ইমনে রচিত গান "এই উদাসী হাওয়ার পরে পথে" "বিফল ব্যথা" কথাটিতে কোমল ঋষভ প্রয়োগ করে ব্যাকরণ হানি ঘটিয়ে ব্যথাকে স্পষ্ট রূপ দিলেন। "আছে দুঃখ,আছে মৃত্যু" এই গানটিতে দুঃখের ও বেদনার মূর্তরূপ ফুটিয়ে তুলতে, বিভাস ও ললিত রাগের মিশ্রণ ঘটালেন আবার রামকেলি ও অ াশাবরী রাগের ছায়াও আনলেন। "ফুল বলে ধন্য আমি" ইমন কল্যাণে রচিত হলেও " দেবতা ওগো" অংশে কোমল ধৈবত ও কোমল নিষাদ ব্যবহার করে গ ানটির পরিপূর্ণতা দিলেন। তেমনই ভীমপলশ্রী রাগে রচিত "আমার সকল দুখের প্রদীপ জেলে" গানটিতে "ব্যথার পূজা" স্থানে ব্যথা কথাটিতে কোমল ধৈবত ব্যবহার করে ব্যথার কোমলতা আনলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে শুধুমাত্র রাগের বিন্যাসেই নতুনত্ব আনেননি, হিন্দুস্থানী রাগ সংগীতের আঙ্গিকেও পরিবর্তন ঘটিয়ে স্বকীয় সংগীত রচনা করেছেন। খেয়াল গ ানে সাধারণতঃ দুইটি মাত্র তুক থাকে। স্থায়ী ও অন্তরা। রবীন্দ্রনাথ যে সকল গান খেয়ালাঙ্গ ধরণে রচনা করলেন, তাতে আরো দুটি তুক সঞ্চারী ও আভোগ এল। কোনো ক্ষেত্রে বা সঞ্চারী নেই, একাধিক অন্তরা এল। যেমন ত্রিতালে "আঁখি জল মুছাইলে জননী।" অথবা একতালে গাওয়া – " তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে" গানটি। আর চার তুকে বিভক্ত খেয়ালাঙ্গ গানের মধ্যে ইমনের রাগে আড়াঠেকাতে "এ মোহ আবরণ খুলে দাও", ইত্যাদি। এই চার তুক বিশিষ্ট গানগুলি প্রমাণ করে, রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদ প্রীতি। ধ্রুপদ সংগীতে বিশুদ্ধ গমক ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার অলংকার ব্যবহার নিষিদ্ধ। ধ্রুপদ গানের মর্যাদা কেবল শব্দেরই প্রাপ্য নয়,

সুর ও কথা মিলে যে রস জন্মায়, কেবল তারই প্রাপ্য।

ধ্রুপদ রবীন্দ্রসংগীতের প্রাণ। তার সংগীত ধ্রুপদের গভীরতায় আচ্ছন্ন। তিনি নিজে যে কয়টি তাল সৃষ্টি করেছেন, তা ধ্রুপদাঙ্গের রবীন্দ্রসংগীত মাত্রই ব্যবহার করেছেন। তালগুলি হল – ঝম্পক (পাঁচ মাত্রা), নবতাল (নয় মাত্রা), একাদশী (এগারো মাত্রা), এবং নবপঞ্চ তাল (আঠারো মাত্রা)। ধ্রুপদাঙ্গ রবীন্দ্রসংগীতের তাল ও রাগ সহকারে বিভিন্ন পর্যায়ের গানের কিছু উদাহরণ রবীন্দ্রসংগীত প্রেমীদের জন্য নিচে দেওয়া হল – এই ধরণের অগণিত গানের মধ্য থেকে।

ধ্রুপদাঙ্গ রবীন্দ্রসংগীত

ক) পূজা পর্যায়ে

তাল ঃ চৌতাল		রাগ
১)	অসীম আকাশে অগণ্য কিরণ	মাকেদারা
২)	আইল শান্ত সন্ধ্যা	শ্রী
৩)	আছ অন্তরে চিরদিন	কাফী
৪)	আজি মম মন চাহে	বাহার
৫)	আজি হেরি সংসার অমৃতময়	বিলাবল
৬)	আনন্দ রয়েছে জাগি	হাম্বীর
৭)	আমারে করো জীবনদান	শঙ্করা
৮)	এখনো আঁধার রয়েছে হে নাথ	আশাবরী
৯)	ওঠো ওঠো রে বিফলে প্রভাত	বিভাস
১০)	কে যায় অমৃতধাম যাত্রী	বেহাগ
১১)	কেমনে ফিরিয়া যাও	ভৈরবী
১২)	জগতে তুমি রাজা	কানাড়া
১৩)	ডুবি অমৃত পাথারে	ললিত
১৪)	তোমারি মধুর রূপে	ঝিঁঝিঁট
১৫)	তোমা লাগি নাথ হে	পূরবী
১৬)	প্ভাতে বিমল আনন্দে	গুর্জরী টোড়ী
১৭)	ভয় হতে তব অভয় মাঝে	বেহাগ

তাল ঃ সুরফাঁকতাল

১)	আনন্দ তুমি স্বামী	কামোদ
২)	দাঁড়াও মম, অনন্ত ব্রহ্মান্ডমাঝে	ভীমপলশ্রী
৩)	পান্থ এখনো কেন অলসিত অঙ্গ	যোগিয়া
৪)	পতি দিন তব গাথা গাব আমি	মিশ্র বাঁরোয়া
৫)	প্রথম আদি তব শক্তি	দীপক
৬)	বাজাও তুমি কবি তোমার সংগীত	বাহার
৭)	শান্তি কর বরিষণ	তিলক কামোদ
৮)	শূন্য হাতে ফিরি হে	কাফী

তাল ঃ ধামার

১)	অমৃতের সাগরে	কামোদ
২)	এত আনন্দধবনি উঠিল	বেহাগ
৩)	গরব মম হরেছ প্রভু	দেশ
৪)	ডাকিছ কে তুমি	খাম্বাজ
৫)	বীণা বাজাও হে মম অন্তরে	পূরবী
৬)	হরষে জাগো আজি	হাম্বীর
৭)	হৃদি মন্দির দ্বারে বাজে	কেদারা

তাল ঃ আড়া চৌতাল

১)	শুভ্র আসনে বিরাজো	ভৈরব
২)	সংসারে কোন ভয় নাহি	ইমন কল্যাণ
৩)	সবে আনন্দ করো	মিশ্র বিলাওল

তাল ঃ ঝাঁপতাল

১)	অন্তরে জাগিছ অন্তরগামী	বেহাগ
২)	চরণধবনি শুনি তব নাথ	সিন্ধু
৩)	ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবে	সাহানা
৪)	তুমি ধন্য ধন্য হে	কেদারা
৫)	তোমায় যতনে রাখিব হে	দেশ-খাম্বাজ
৬)	প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী	কাফী

তাল ঃ তেওড়া

১)	আজি বহিছে বসন্ত পবন	বাহার
২)	আমার বিচার তুমি কর	কেদারা
৩)	আমার মাথানত করে দাও হে	ইমন কল্যাণ
৪)	আমার মিলন লাগি তুমি	বাগেশ্রী বাহার
৫)	আমি হেথায় থাকি শুধু	পরজ বসন্ত
৬)	আর কত দূরে	হাম্বীর
৭)	কবে আমি বাহির হলেম	ইমন কল্যাণ
৮)	কার মিলন চাও বিরহী	শ্রী
৯)	জীবনে যত পূজা হল না সারা	ভৈরবী
১০)	দাঁড়াও আমার আঁখির আগে	বেহাগ
১১)	নিশীথ শয়নে ভেবে রাখি মনে	বাগেশ্রী
১২)	মোরে ডাকি লয়ে যাও	মিশ্র রামকেলী

তাল ঃ বিলম্বিত ত্রিতাল

১) আজি মম জীবনে নামিছে — আড়ানা

২) এবার নীরব করে দাও হে — কানাড়া

তাল ঃ নবপঞ্চতাল

১) জননী তোমার কণ চরণখানি — মিশ্র গুণকেলি

তাল ঃ একাদশী

১) দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া — সুরট-মল্লার

তাল ঃ নবতাল

১) নিবিড় ঘন আঁধারে — সাহানা

২) প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে — মিশ্র টোড়ি

খ) স্বদেশ পর্যায়ে

তাল ঃ চৌতাল

১) এ ভারতে রাখো নিত্য প্রভু — সুরট

২) ঢাকো রে মুখ, চন্দ্রমা — গৌড় মল্লার

গ) প্রেম পর্যায়

তাল ঃ চৌতাল

১) গহন বনে পিয়াল তমাল — হাম্বীর

২) মন জানে মনোমোহন আইল — নট

তাল ঃ ধামার

১) সাজাব তোমারে হে — নট হাম্বীর

২) হিয়া কাঁপিছে সুখে — জয় জয়ন্তী

ঘ) প্রকৃতি পর্যায়ে

তাল ঃ চৌতাল

১) নব নব পল্লবরাজি — বাহার

তাল ঃ ঝাঁপতাল

১) নিবিড় অন্তরতর বসন্ত এলো প্রাণে — বাগেশ্রী বাহার

ঙ) বিচিত্র পর্যায়ে

তাল ঃ চৌতাল

১) তিমিরময় নিবিড় নিশা মেঘ

খেয়ালাঙ্গের রবীন্দ্রসংগীত গুলিতে বাংলার বিষ্ণুপুর ঘরাণার ছোঁয়া। বিষ্ণুপুর ঘরাণার ইতিহাস বলে তানসেন বংশীয় সদারঙ্গ শিষ্য মহম্মদ খাঁর কাছে গান শিখে ১৯ শতকের প্রথমার্ধে কানাই চক্রবর্তী ও মাধব চক্রবর্তী বিষ্ণুপুরে প্রথম খেয়াল গানের চলন করেন। তৎকালীন বিষ্ণুপুরের রাজা মদনমোহন এঁদের উৎসাহিত করেন। এর ফলে তানসেন ঘরাণার উচ্চাঙ্গ সংগীত ক্রমে ক্রমে বাংলার বিষ্ণুপুরী ঢং নামে বাংলায় পরিচিত হয়ে উঠল। এই সেনী বংশের গানে ছিল সজীব প্রাণের প্রবাহ। কারণ, তানসেন ঘরাণার গাইয়েরা স্বাভাবিক ক্ষমতা বলে গান গাইতেন, এক জায়গায় থেমে থাকেন নি। বাঁধা পথ ভেঙে চলতে, কখনও দ্বিধা করেন নি, শ াস্ত্র বাক্য মেনে চলতে চলতে গানের প্রয়োজনে পরিবর্তনের সাহসও দেখিয়েছেন। পশ্চিমী এই ঘরাণার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলার বিষ্ণুপুরী ঘরাণাও তা সমাদরে গ্রহণ করেছে। রবীন্দ্রনাথের খেয়ালাঙ্গের গানেও তার প্রতিফলন হয়েছে। " তোমার সুর শুনায়ে যে ঘুম ভাঙাও" গানে আশাবরীতে শুদ্ধ ঋষভ এর জায়গায় কে ামল ঋষভ এর ব্যবহার। "তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে" গানেতে কড়ি মধ্যম যুক্ত রামকেলী নেই। পূরবী রাগাশ্রিত অনেক গানেই শুদ্ধ ধৈবতের সংগে মাঝে মাঝে কোমল ধৈবতের ব্যবহার পাই গানের কথাটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। যেমন, 'সন্ধ্যা হল গো মা" অথবা "অশ্রুনদীর সুদূর পারে।"

এবার খেয়ালাঙ্গ রবীন্দ্রসংগীতের কিছু উদারহণ তুলে ধরছি --

খেয় ালাঙ্গ র বীন্দ্রসংগীত
পূ জা পর্য ায়
রাগ - তাল
১) আঁখিজল মুছাইলে জননী --- রামকেলী-ত্রিতাল
২) আজি নাহি নাহি নিদ্রা --- মিশ্র সিন্ধু-ত্রিতাল
৩) এ মোহ আবরণ খুলে দাও --- ইমন-আড়াঠেকা
৪) ঘোরা রজনী, এ মোহ ঘনঘটা --- মিশ্রকানাড়া-ত্রিতাল
৫) চিরসখা, ছেড়ো না মোরে --- বেহাগ-ত্রিতাল
৬) ডাকো মোরে আজি এ নিশীথে --- পরজ-ত্রিতাল
৭) দুঃখ রাতে হে নাথ কে ডাকিলে --- সুরফর্দা-আড়াঠেকা
৮) বিমল আনন্দে জাগো রে --- আশাবরী-আড়াঠেকা
৯) মন্দিরে মম কে আসিলে --- আড়ানা-একতাল
১০) স্বপন যদি ভাঙিলে --- রামকেলী-একতাল

প্রকৃতি পর্যায়ে
১) অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে --- মিশ্রকাফী-ত্রিতাল
২) আজি কমল মুকুল দল খুলিল --- মিশ্রবাহার-ত্রিতাল
৩) কোথা যে উধাও হল --- মিশ্রমল্লার-আড়াঠেকা

টপ্পা শু হয়েছে খেয়ালের পরে। শোরী মিঞা নামে পাঞ্জাবের একজন গুণীর সৃষ্টি এই গান। শোনা যায় তিনি আবার এই গানের ঢঙ উটচালকদের গান থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সৃষ্টি করেছিলেন। পরে এই গান উচ্চাঙ্গ সংগীতের স্থান পেল গুণীজনদের চেষ্টায়। তাঁরা এই গানের মূল আদর্শকে বিস্তারিত করে অলংকার দিয়ে সাজিয়ে নিলেন। বাংলার গুণী শিল্পী মহলে, ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতির সঙ্গে টপ্পার প্রভাবও ছিল খুব বেশী। রবীন্দ্রনাথ বাংলার টপ্পার আদর্শে গান রচনা করেও ধ্রুপদের মতো চারটি তুকের নিয়মেই তাকে ভাগ করেছেন।
টপ্পা অঙ্গের কিছু রবীন্দ্রসংগীতগুলি হল --
১) এ পরবাসে রবে কে --- সিন্ধু-মধ্যমান
২) কে বসিলে আজি হৃদয়াসনে --- সিন্ধু-মধ্যমান
৩) পিপাসা হায় নাহি মিটিল --- ভৈরবী-ত্রিতাল
৪) হৃদয় বাসনা পূর্ণ হল --- ঝিঁঝিঁট-মধ্যমান
এছাড়াও স্বাধীনভাবে রাগ-রাগিণীর ভাঙাগড়া খেলায় টপ্পাকে আল্‌তো করে ছুঁয়েছেন তিনি অনেক গানের ক্ষেত্রে। এগুলিকে টপ্পা ভঙ্গিম রবীন্দ্রসংগীত বলা হয়। যেমন --
১) দূরে কোথায় দূরে দূরে
২) পথ চেয়ে যে কেটে গেল
৩) যা হবার তা হবে
৪) লক্ষ্মী যখন আসবে
৫) সার্থক জনম আমার
৬) আমি রূপে তোমায় ভোলাব না
৭) এরা পরকে আপন করে
৮) ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার

৯) কিছুই তো হল না
১০) দিন যায় রে দিন যায় বিষাদে।
রবীন্দ্রসংগীত অন্তর্নিহিত প্রেরণা ও অন্তরের গভীর আনন্দানুভূতি থেকে প্রকাশ পায়। এ সংগীত মুক্তির সংগীত। রবীন্দ্রনাথ তাই গানে বলেছেন –
"আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে,
আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে।
দেহমনের সুদূর পারে হারিয়ে ফেলি আপনারে,
গানের সুরে আমার মুক্তি ঊর্ধ্বে ভাসে।"
বাংলা গান তাই রবীন্দ্রনাথের হাত ধরেই মুক্তি পায়। গভীর সংগীতানুরাগের গুণে তিনি ভারতীয় সংগীতের মর্মস্থানে পৌঁছে তার রহস্য উদ্‌ঘাটিত করে সকলের সামনে ধরতে পেরেছিলেন। তাই তিনি বাংলা সংগীতের প্রথম আধুনিক রচয়িতা। পরে হিন্দুস্থানী সংগীতের হিন্দী অনুকরণে বাংলা ভাষায় নানা প্রকার গান রচনা শুরু হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ-ই প্রথম পথিক যিনি তাঁর কবিত্বশক্তির সাথে রাগ-রাগিণীর ভাব মিলিয়ে বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেন। রাগ-রাগিণীর মাধুর্য বজায় রেখেই তা সৃষ্টি করেছেন।

রবীন্দ্রসংগীত প্রেমীদের এই ভাবধারায় অবগাহন করেই রবীন্দ্রনাথের গান পরিবেশনে অনুপ্রাণিত হওয়া উচিৎ। রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যেকার রাগ-রাগিণীর জগৎ ও তার নানাপ্রকার গীত প্রকরণ গানের কথার রস প্রকাশের দিক থেকে বিশেষ মূল্যবান সম্পদ। গানের কথায় যে আনন্দ, বেদনা, অনুভূতি, প্রকৃতি, নিবেদন ও সমর্পণ আছে, সেগুলি সুরের স্বতঃস্ফূর্ততায় সহজে সহজে উচ্চারণ করে গাইতে হবে। তবেই রবীন্দ্রসংগীতের সৌন্দর্য বিকশিত হয়। রবীন্দ্রসংগীতের মর্মলোকে পৌঁছনো যায়।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com